বর্তমানের দর্পণে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন: নাগরিক চেতনা

সুলতানা কামাল

এটা খুব একটা আশ্চর্য্যের অথবা অভাবিত বিষয় নয় যে, মানুষ তার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হবে– বারংবার জানতে চাইবে, বুঝতে চাইবে কি হতে চলেছে সামনের দিনগুলিতে। আর এটাও অস্বাভাবিক নয় যে বর্তমানের প্রেক্ষিতেই মানুষ তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা অথবা আশা-নিরাশা ব্যক্ত করে থাকে। এ কথাও কারো অজানা নয় যে ভবিষ্যতটা একসময় ছিল বর্তমানের গর্ভে। সেই বর্তমান আবার তৈরি হয়েছে অতীতের উপর ভর করে। তাই ভবিষ্যতের নিশানা পেতে হলে অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয় বৈকি। তবে অতীতের সব খুঁটিনাটি দৃষ্টির পরিধিতে ধরা যায় না, তাই দৃষ্টিপাত করতে হয় ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উপর, ঐতিহ্যের উপর। ঐতিহ্য যদিও ইতিহাসেরই অংশ, ইতিহাসের সব কিছুকে সব জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি নাও দিতে পারে, আবার সব কিছুই ঐতিহ্য তার ইতিহাস গড়ে দিয়েছে এমন ধারণার সমর্থনও সর্বজনীন নয়। তবে আমার মত হল ভবিষ্যতের পথ খুঁজে পেতে ইতিহাস ও ঐতিহ্য উভয় ক্ষেত্রকেই গুরুত্বের সংগে জেনে নেওয়া, বুঝে নেওয়া প্রয়োজন আর সেই বুঝে নেওয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। সেই কারণেই আজকের উপস্থাপনার জন্য আমি লেখার বিষয়ে নাগরিক চেতনাকে যুক্ত করেছি। এখানে নাগরিক বলতে বুঝাতে চেয়েছি রাষ্ট্রের সেই উপাদান– যাকে সাধারণত জনগণ বা জনগোষ্ঠি হিসাবে অভিহিত করা হয়। আমি তাদের নাগরিক বলতে চাই আধুনিক অর্থে যারা কোনও রাষ্ট্রের বা রাজ্যের অধীনস্থ জনগোষ্ঠি নন, মনে-প্রাণে, ধ্যান-ধারণায়, আচার-আচরণে সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রের মূল্যবান এবং সার্বভৌম উপাদান এবং সচেতনভাবে তার শর্ত পূরণ করেন। এরা শুধুমাত্র নগরবাসী অর্থে নাগরিক নন। এরা এদের নিজেদেরকে চেনেন, জানেন কোথা থেকে তারা এসেছেন এবং সেই সুবাদেই সম্পূর্ণ সচেতন আছেন যে কোথায় যাবেন। সচেতনতার আর একটি পরিচয় তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে যখন তারা এই স্বাক্ষর রাখতে পারবেন যে তারা নিষ্ক্রিয়ভাবে ইতিহাস তাড়িত নন, ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন কখনও কখনও কিন্তু এরা ইতিহাস সৃষ্টিকারীও বটে। এটা হলো আদর্শ অবস্থানের চিত্র। এর ব্যত্যয় ঘটলে যা ঘটতে পারে তার অনেকটাই প্রকৃতপক্ষে ঘটে গেছে আমাদের বাংলাদেশে।

আমরা শুরুটা করেছিলাম ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির প্রায় সাথে সাথেই। এদেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর উপর ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি– কিংবা বলা যায় তার অস্তিত্বের প্রতি যে অস্বীকৃতি এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের নীতি তদানিন্তন পাকিস্তানী সরকার গ্রহণ করেছিল মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে জানান দিয়েছিল যে সেটা তারা মেনে নেবে না। সেই থেকেই আমাদের বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রার শুরু। সে যাত্রাপথ যে মসৃণ হয়নি সেটা আমাদের অভিজ্ঞতায় গাঁথা আছে সুস্পষ্টভাবে। অবশ্য তার বর্ণনা দেয়া আমার আজকের বক্তব্যের মূল বিষয় নয়– কিন্তু যে লক্ষ্যে আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম, তা যেন বিস্মৃত না হই সে চিন্তা থেকেই বারবার কথাগুলি উচ্চারণ করি।

আজকে যে প্রশ্ন আমাদের সবার মনে মনে অথবা মুখে মুখে ঘুরছে তা হলো আমরা কোথায় চলেছি? অস্বীকার করার উপায় নাই নানা মানদণ্ডে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। উন্নয়নের ধারায় দেশটির গতিশীলতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে এই জন্য যে, বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রসরমানতার একটা প্রবাহ বেশ জোরের সাথেই ধাবমান রয়েছে, যার স্বীকৃতি নানা পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশে চিহ্নিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার ৪৪ বছরে বাংলাদেশের অর্জনের মাত্রা তুচ্ছ করার মতো নয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের আরাধ্য লক্ষ্যের পথে চলা মানুষদের এই স্বাধীন দেশেই এখনও স্রোতের বিপরীতে হাঁটা মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে কেন এই স্ববিরোধীতা? তাহলে পথ চলতে চলতে উন্নয়ন নিশ্চিত করেও কি কোথাও আমরা বিপরীতমুখে হেঁটেছি? এর উত্তর পাওয়া মোটেও কঠিন নয়। ইতিহাসই বলে দেয়– পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ কতবার কতভাবে হোঁচট খেয়েছে। কতবার দেশটির সামনে এগিয়ে যাওয়াকে একেবারেই পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেও তো ইতিহাসে অজানা নয়। শুধু কি তাই? ইতিহাস বিকৃতির যেন মহোৎসব চলেছে এই দেশে এবং তা এতটাই জোরের সাথে করার চেষ্টা নেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ইতিহাসের স্বরূপ চেনার কোনও উপায়ই যেন থাকেনি। মানসে-মননে, চিন্তায়-ভাবনায়, দৈনন্দিন আচার-বিচার, জীবন-যাপন পদ্ধতি সব কিছুতে এর আগ্রাসী হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা হয়েছে। তার ফলে ইতিহাসের একটা পর্যায়ে এসে যে চ্যালেঞ্জটার মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে তা হলো আত্মবিস্তৃতি। যে জাতি নিজের পরিচয়ই ভুলে যেতে বসে, সে তার গন্তব্য স্থির করবে কোন বিবেচনায়? তাই ইতিহাসটাকে সত্যের নিরিখে স্মরণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকের কাছে এই বারংবার স্মরণে আনার বিষয়টি অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমি সেটা অত্যন্ত জরুরি মনে করি এই কারণে যে, নিজের ভিত্তিটাকে ভালো করে না চিনে নিতে পারলে বর্তমানের স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়া আজকে যাকে স্মরণ করার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যিনি সামরিক সমরের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে নয়, সেই পাকিস্তানী আমলেও তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা রাখার জন্য পাকিস্তানী মহলে নিন্দিত হলে নন্দিত হয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও তিনি তাঁর স্বভাসুলভ দৃঢ়তায় যে কোনো অনভিপ্রেত নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

একটু বলে নিতে চাই যে, যে ভাবনা আর আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশের ভিত গড়ে তুলেছিলাম আমরা, আজকে তার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যে দুষ্কর সে ব্যাপারে অধিকাংশজনই সহমত হবেন। আগের কথার সূত্র ধরেই বলি, বাংলাদেশ তো প্রশংসনীয়ভাবে সামনে এগিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো যুদ্ধাপরাধের বিচারের শুরু ও উল্লেখযোগ্যভাবে তার অনেকটাই সম্পন্ন করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সূচকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উত্তরিত হওয়া। তারপরেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তো আমরা সেইভাবে কমিয়ে আনতে পারিনি। ধনী লোকের সংখ্যা বেড়ে থাকলেও যে কোন পরিসংখ্যান বা পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ফাঁক অনেক বেড়ে গেছে। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রম বিস্তৃত করার সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সে শিক্ষার ফলাফল না সম-মানে, না সম-মর্যাদায় সবার কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে। মৌলিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। মাতৃমৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে– কিন্তু উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা 'ক্রয়' করার ক্ষমতা যে সীমিত, তাতো একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিভিন্ন সূত্রে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে নারী-নির্যাতনের হার কমে যাওয়ার সুসংবাদ পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে তা আমাদের মনে স্বস্তির কারণ ঘটাচ্ছে। কিন্তু নারী নির্যাতনের প্রকটতা কি পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। তার চেয়েও বড় কথা নারীকে নানাভাবে হয় গৃহবন্দী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অথবা ঘরের বাইরে তার অধিকারকে শর্তাধীন করে ফেলার কৌশলগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্রয় ও কৌশল ক্রমশ ভয়াবহভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে থাকলেও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনায়, পরিবারের আবহাওয়ায়, সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রের

দোদুল্যমান ভূমিকায় নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্ত্বার কুণ্ঠিত রূপটি পীড়াদায়কভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পুরুষের ভিতরেও এই মানসিকতার প্রভাব লক্ষ্যনীয়, তবে নারীকে এর ভার বহন করতে হয় অনেক বেশি করে। যেহেতু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই চাপ ক্রমশ সমাজেও অভিঘাত সৃষ্টি করে, তার ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার আগ্রাসী এবং সংকীর্ণ আচরণ কম সংখ্যার জনগণকে ভীত, শংকিত ও অনিরাপদ অবস্থায় ঠেলে দেয়। তাদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করে আর যখন তারা নাচার হয়, দেশত্যাগকেই একমাত্র উপায় বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র নিয়ে স্বকৃত পরিচয়ে বাঁচতে চায়– তারাও পতিত হয় নানা বিপর্যয়ে। যে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির দাবীতে বাংলাদেশের জন্মের শুরু, তার কারণেই নিগৃহীত হতে হয় তাদের অনেককে। ধর্মান্ধ, জঙ্গিগোষ্ঠির দাপটে অনিরাপত্তাবোধের ছায়া ঘিরে ধরেছে মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রটিকে।

সত্যজিত রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' এর হাল্লা রাজার দেশের মানুষের মত এদেশের মানুষেরও কথা বলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর কথোপকথন স্মরণ করি– 'কথা তো বলি আমরা কিন্তু মানে করেন তেনারা' এবং তার প্রেক্ষিতে শাস্তি প্রায় অনিবার্য্য। অথচ সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্নে ছিল একটি গণতান্ত্রিক, মুক্তবুদ্ধির, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে নেওয়া– যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, কে কোথায় জন্মেছে নির্বিশেষে একটি সমান অধিকার, সমান মর্যাদা ও সমান সম্মানে মাথা উঁচু করে বাঁচবে সবাই। কোন পরিচয়ের কারণেই ভীত-শংকিত থাকতে হবে না, থাকতে হবে না অন্যের অধস্তন হয়ে। সংবিধান বলছে 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' ঠিক তার পরেই প্রত্যয়ী ঘোষণা: 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

সংবিধান আরও বলছে: 'ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য–
(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা;
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান;
(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার;
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

উপরোক্ত এক একটি অনুচ্ছেদ-এর বিশ্লেষণ করলে স্বপ্ন আর বাস্তবের অমিলে রীতিমত কষ্ট পেতে হয়। এত রক্তের বিনিময়ে, এত প্রাণক্ষয়, এত প্রাণদান কিন্তু বাস্তব এত ভিন্নরূপ নিলো কি করে?

সহজ উত্তর বাংলাদেশের গড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়েছে বারবার। অগণতান্ত্রিক, সামরিক শক্তি থাবা হেনেছে দেশটির জন্মের পরপরই। যারা দেশটির জন্মের বিরুদ্ধে ছিল, মানবতাবিরোধী নানা অপরাধে লিপ্ত থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যায় হাতে হাত মিলিয়েছে তারা পুনর্বাসিত হয়ে দেশটির মুখ সজোরে উল্টাদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে চাবুক মেরে পিছনের দিকে চলতে বাধ্য করেছে।

একথা কারো কাছে অবিদিত নয় যে, এই উল্টাপথে চলার প্রক্রিয়ায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা সব কিছুতে তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এসেছে নানা পরিবর্তন। এমনকি ৯০-এর দশকের শেষ অবধিও যে উদার সমতাভিত্তিক প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সারা বিশ্বের মানবগোষ্ঠিকে উদ্বেল করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে তা যেন ক্রমশই মুছে যেতে থাকলো মানুষের মন থেকে। মানুষ ক্রমাগত ঝুঁকে পড়তে থাকলো সংকীর্ণ গোষ্ঠিকেন্দ্রিক রাজনীতির দিকে। যে যেমন করে পারো নিজের বাঁচার সংস্থান করে নাও, যে কোন পন্থায় সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করে নাও, এই নীতি সকল নীতি ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠা পেলো। অসহিষ্ণু, সন্ত্রাসী, আগ্রাসনের নীতি অপ্রতিরোধ্যভাবে দখল করে নিতে থাকলো মানুষের মন-মানসিকতা। কত সহজে নিজ পরিচয়ের অজুহাতে– বিশেষত ধর্মীয় পরিচয়ে অন্যের উপর আঘাত হানার উদাহরণ পাওয়া যায় যত্রতত্র। ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসবের কারণে বাংলাদেশের মূল স্রোতধারার চরিত্রটিও সেই রূপটাই ধারণ করেছে। রাজনীতিকরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করে সমর্থনের আশায় সেই স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেয়। জাতির মানস গঠনে তাদের দৃঢ় ভূমিকার যে একটা প্রয়োজন আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় অথবা অগ্রাহ্য করে। তার ফলে মুক্তিযুদ্ধের যে আদি চিন্তাধারাটা বাংলাদেশের স্নায়ূতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বহমান থাকার কথা সেটা মাঝে মাঝেই থমকে গেছে, জট পাকিয়ে গেছে আর তাকে চিনে নেওয়ার কোনো উপায় যেন থাকেনি। যারা নিষ্ঠার সাথে সেই ধারার সাথে চলতে চেয়েছে তারাই অদ্ভুতভাবে চিহ্নিত হয়েছে স্রোতের বিপরীতের মানুষ বলে।

আমি অতীতমুখীন নই। একথা মানি যে, বর্তমানকে অতীতে প্রতিস্থাপন করা কাজের কথা নয়। কিন্তু যদি এইভাবে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করি যে নদী কখনও উৎসমুখে ফিরে যায় না, যেতে চাইলে তার চলা যাবে বন্ধ হয়ে। কিন্তু একই সাথে উৎসের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হলে সে নদী বেঁচে থাকে না। তার বহমানতার জন্যই তাকে উৎস থেকেই মূল শক্তিটা সংগ্রহ করে নিতে হয়। ইতিহাসও তাই বলে।

আর একটি বিষয় অনুধাবন করাও গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিকই যে মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকারকে অবলম্বন করেই বাংলাদেশকে গড়ে নিতে হবে– সেটা উত্তরাধিকারকে বিক্রি করে কখনই অর্জন করা যাবে না। ঠিক যেমন অযোগ্য উত্তরাধিকারী তার উত্তরাধিকার বেচে বেচে দেউলিয়া হয়ে যায়– এ ক্ষেত্রে সেরকমটি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সচেতন নাগরিকের আচরণ হতে হবে সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর মতো– যারা অর্জিত উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করে, সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন নাগরিক তার সচেতনতার পরিচয় রাখতে পারে সেই মর্মে তার নিষ্ঠার স্বাক্ষরের মাধ্যমে। সত্যিকার অর্থে একজন নাগরিককে সচেতন বলা যায় যখন সেই নাগরিক ইতিহাস সচেতন হন– তার ধারায় বর্তমানকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ভবিষ্যত নির্মাণের নির্দেশনা দিতে পারেন। যিনি ঐতিহ্যকে ধারণ করে ভবিষ্যতের স্বরূপ আঁকতে পারেন। একজন সচেতন নাগরিকই পারেন এই নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তার যথাযথ ভূমিকাটি পালন করতে। আর যখন একের সাথে আর, নিজের সাথে অপরের সচেতনা মিলে তৈরি হয় গণ সচেতনতার, তখনই ঘটে সম্মিলিত শক্তির উদ্বোধন। সেই সম্মিলিত শক্তি জন্ম দেয় স্বাধীন-সার্বভৌম সামাজিক সক্রিয়তা। দেশের মানুষ যখন সার্বভৌম হয়, তখনই নিশ্চিত হয় দেশের সার্বভৌমত্ব। সেটা অর্জন করতে অবশ্যই আমাদের হতে হবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক– যার প্রতিবিম্বের আলোকে আমরাই রচনা করব ভবিষ্যতের স্বর্গ তোরণ।